বি না য় ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

প্রবাসে, কবিতা-ক্লাসে

আমেরিকায় গিয়েছি, খাব-দাব, কলকলাব! আবার ক্লাস-ফাস কীসের? এমনটাই ভেবেছিলাম হয়তো। কিন্তু আইওয়াতে পা দেওয়ার কয়েকদিন পরেই ভুলটা ভেঙে গেল। বলা ভালো, ভাঙিয়ে দেওয়া হল। আমাকে (এক আমাকেই নয় অবশ্য) খুব নরম এবং ততোধিক স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার দেশের কবিতার একটা রূপরেখা ওরা পেতে চান, আমার মাধ্যমেই। এই একই কথা শুনে মিশর থেকে আসা আহমেদ কিংবা লিথুয়ানিয়া থেকে আসা লরিনাস-এর তেমন কোনো হেলদোল হল না, কারণ একটাই ভাষা ওদের দেশের এবং সেই ভাষার কবি এবং কবিতা সম্বন্ধে লেখাটা, এমন কিছু সমস্যার নয় ওদের কাছে। কিন্তু আমাদের দেশে তো স্বীকৃত ভাষার সংখ্যাই চব্বিশ। আমি তার মধ্যে বলতে পারি, বুঝতে পারি বা লিখতে পারি, কতগুলো? প্রথমে কাটাবার জন্য আমি, 'বাড়ি তার বাংলা' গোছের কয়েকটা কথা বলা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমার কথার প্রায় মাঝখানেই আইওয়া ইনটারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর হিউ আমায় জানিয়ে দিলেন যে, যদি বাংলাদেশকে রিপ্রেসেন্ট করতাম তাহলে আমার থেকে শুধু বাংলা কবিতার ব্যাপারেই জানতে চাওয়া হত কিন্তু যেহেতু আমি 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিত্ব করছি তাই...

শ্যামবগ হাউস থেকে আমাদের লেখকদের আস্তানায় ফেরার পথে ভেবেছিলাম এখন করি কী? আমার সঙ্গে হাঁটছিল মুজিব, আফগানিস্তানের ছেলে, ও বিড়বিড় করছিল কয়েকটা লাইন, ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুমি ক-টা ইন্ডিয়ান ভাষার নাম জানো? আমাকে চমকে দিয়ে, মুজিব, তামিল-তেলেগু সমেত ছ-সাতটা ভাষার নাম বলে দিল। মুজিবই যখন এত জানে তখন আইওয়ার কর্তৃপক্ষ না জানি কতটা ওয়াকিবহাল, আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। হোটেলের রুমে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরই আবার বেরোতে হল, সুপারমার্কেট থেকে তরিতরকারি-দুধ-ফুধ আনতে। কিন্তু মন দিয়ে বাজার করতে পারলাম না, আটচল্লিশ ঘণ্টা পরের ইনট্রোডাকটরি কবিতা

-ক্লাসের কথা ভেবে। মুজিব আমার সঙ্গেই বাজার করতে এসেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ওদের দেশে কটা ভাষা চলে।

মুজিব বলল, দুটো। পুস্তু আর ফারসি।

—তুমি কোন ভাষায় লেখো?

—মুলত ফারসি। তবে অনেকসময় একটাই কবিতা দুটো ভাষাতেও লিখি। এই একটু আগেই যেমন লিখছিলাম।

—কী কবিতা লিখলে, একটু শোনাও।

—কবিতাটা আগের। এখন ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করছিলাম। দ্যাখো তো কেমন হয়েছে।

—শোনাও।

—কবিতাটার নাম 'মালালা'। আর কবিতাটা হচ্ছে, 'A head without borqa is a head with a bullet / why did you take the pencil / And draw a head without borqa?'

—দারুণ হয়েছে। কিন্তু তুমি কি এটা কাবুলেও পড়তে পারো?

—পড়ি তো। ইউনিভার্সিটির একটা প্রোগ্রামে পড়লাম, আমেরিকা আসার জাস্ট আগে। দু-চারটে লোক বেশ কটমট করে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ওদের মধ্যেই কোনো তালিবান লুকিয়ে আছে হয়তো, দেবে আমারও মাথায় গুলি করে। মুজিব জোরে হেসে উঠল।

আমি ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম। যেমন আমির খানের মতো দেখতে, তেমনি সাহস। সুপারমার্কেট থেকে ফেরার পথে নিজের আরও একটা কবিতা শোনাল মুজিব। আর এবার পুস্তু আর ফারসি দুটো ভাষাতেই অরিজিনালটা শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন ভাষাটা শ্রুতিমধুর লাগল তোমার?

ও রকম মুহূর্তের মধ্যে দুটো সম্পূর্ণ অচেনা ভাষা শুনে, কোনো কমেন্ট করা সম্ভব নয়, কোনটা কানে বেশি মিষ্টি ঠেকল, তাই নিয়ে। আমি তাই মুজিবকে বললাম, ইংরেজিতেই কবিতাটা আর-একবার শোনাতে।

মুজিব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, এটা শেষ করেই শোনাচ্ছি। আর তারপর সিগারেট মুখে নিয়েই আরম্ভ করল : 'Time was not changing on the standing waters / there was not a wave that could turn the moment to the other side / and we were distinguished by blood from the color of our homeland / and the blood was also separating us from the present / we cannot get rid of ruins / and only grave can hide our bloody hands'

লাইনগুলো এমন আলগোছে বলে গেল মুজিব যেন বা নামতা বলছে। কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার পর বহুক্ষণ আমার মাথার মধ্যে বাজতে লাগল শব্দগুলো। সময় কি সত্যিই পালটায়, না পালটায় না একেবারেই? এমন কোনো ঢেউ কি ওঠে যা মুহূর্তকে

দাঁড় করিয়ে দিতে পারে অন্যদিকে? রক্ত শুধু আমার বাসভূমি থেকে নয়, আমার যাপন, আমার সংস্কৃতি, আমরা ইতিহাস আর ভবিষ্যতের থেকেও আলাদা করছে আমাকে। ধ্বংসস্তূপ, এত ধ্বংসস্তূপ চারদিকে, যে আমি তার থেকেও পরিত্রাণ পাচ্ছি পড়ছে না কোথাও। আর কবর, শুধু কবর তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমার রক্তাক্ত সমগ্রকে আড়াল করবে বলে।

আমাকে চুপ করে যেতে দেখে মুজিব জিজ্ঞেস করল, কী হল গুম মেরে গেলে কেন?

আমি যেন একটা ঘোরের ভেতর থেকে উঠে এসে বললাম, তুমি তো তোমার অরিজিনাল আর তারপর পুস্ত আর ফুস্ত দিয়ে ফাটিয়ে দেবে। কিন্তু আমি কী করে আমার দেশকে রিপ্রেসেন্ট করি বলো তো? কুড়ি-বাইশটা ভাষা, তার ভেতরে অন্তত আট-দশটা থেকে যদি রেফারেন্স দিতে হয়, তো অনেক ঝক্কির ব্যাপার। সামলাই কী করে?

মুজিব হেসে ফেলল, দূর দূর। তুমি কি এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছ নাকি? তোমার দেশের কোন ভাষায় কে কী লিখছে তাই নিয়ে এরা রিসার্চ করে বসে আছে নাকি? তুমি নিজের ভাষার চারজন কবির লেখা এধার-ওধার করে চালিয়ে দাও না, কে দেখতে যাচ্ছে?

মুজিবের কথা শুনতে শুনতে টের পাচ্ছিলাম, কবিরা সব জায়গাতেই একইরকম, কমবেশি ফাঁকিবাজ, কিন্তু সুপারমার্কেটের বাইরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া, সাদিক একদম হাঁ-হাঁ করে উঠল মুজিবের কথা শুনে। ইরাক থেকে এসেছে সাদিক আর গত পরশু ওর চশমা ভেঙে যাওয়ায়, বেচারি মহা মুশকিলে পড়েছিল। মুশকিল কারণ, আমেরিকায় হেল্‌থ ইনশিয়োরেন্সে প্রভিশন না থাকলে, একটা চশমা বানাতেও প্রায় পাঁচশো ডলার খরচা। আইওয়াতে আসার পর আমাদের যে হেল্‌থ ইনসিয়োরেন্স দেওয়া হয়েছে তাতে চশমা-টশমার কোনো জায়গা নেই, সাদিককে তাই আমরাই কুড়ি-পঁচিশ ডলার করে তুলে দিয়েছিলাম আমরা কজন। আসলে মানুষটা এত ভালো যে ওর কোনো অসুবিধে হলে, মন আপনিই পাশে দাঁড়াতে চায়। ইরাকের মানুষ, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, আর সবচেয়ে বড়ো কথা সাদিক ওর পিএইচডি করেছে পুণা থেকে। সেই সূত্রে সবসময় মুখে একটা হাসি ঝুলছে। মুজিবের প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়ে ও আমায় বলল যে দু-চারজন ভারতীয় কবি সম্পর্কে নাকি ও আমাকে ইনফো দিতে পারে। কিন্তু কথা একটু এগোতেই বুঝলাম যে সাদিকের জ্ঞান নেহাতই ভাসা ভাসা। তার চাইতে অনেকটা বেশি আমার ভাঁড়ারেই আছে। দিনের-পর-দিন 'ভাষানগর'-এ আমায় দিয়ে অজস্র ভারতীয় কবির কবিতা অনুবাদ করিয়েছে সুবোধদা আর মল্লিকাদি। তা ছাড়াও অরুণ কোলাতকারের মতো মারাঠি কবি কিংবা শীতাংশু যশচন্দ্রের মতো গুজরাতি কবিকে, 'ভাষানগর'-এর পাতাতেই পড়া। ওখানেই প্রথম পরিচয় নীলমণি ফুকন কিংবা হীরেন ভট্টাচার্যের মতো অহমীয়া কবিদের সঙ্গে। কিন্তু সেই

সমস্ত ভাষানগর তো আমি বগলদাবা করে আমেরিকায় নিয়ে আসিনি। আর এখানে আসা ইস্তক আমার ল্যাপটপ কাজ করছে না কারণ সে একটু কমা মাল বলে এখানকার 'ওয়াই-ফাই'-এর সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। ওদিকে আমার প্রাথমিক প্রেসেন্টেশনের দিন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সাদিক বলে উঠল, 'You depend on me / like tha warm blood streaming over my skin / You are close to me / like the blood that touches me / lovingly'

শুনতে শুনতে মনে হল, আরে সাদিক তো আমার কাছেই আছে। আমার ল্যাপটপ কাজ না করুক, আমি তো ওর ল্যাপটপের সামনে বসতেই পারি। সাদিক তো ওর নতুন চশমা চোখে দিয়ে আমায় হেল্‌প করতেই পারে কবিতা-ক্লাসের জন্য।

২

সাদিকের ল্যাপটপে বসেই যাবতীয় রিসার্চ শুরু করলাম আমি। নিদা ফজলি থেকে মঙ্গলেশ ডাবরাল, অশোক বাজপেয়ী থেকে দলীপ চিত্রে, রামানুজন থেকে অরুন্ধতী সুব্রামনিয়াম... এক কথায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর ভারতীয় কণ্ঠস্বরের ভেতরে ডুবে গেলাম প্রায়। ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনা করতে ভালোবাসি কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির একটা ছেলে, পড়ার একটা আলাদা ঘরও পাইনি। যেখানে যখন পড়তে বসতাম, গুচ্ছের লোক দেখতে পেতাম। তারা যে আমায় বিরক্ত করবে বলে উদগ্রীব তা নয়, কিন্তু তারা ওই সময়টাতেই আমার পৃথিবীর অংশ হতে চাইত। আসলে যুগটাই ছিল তেমন। একদম আমার একার, কিংবা কপোত-কপোতী যথা বেঁচে থাকার কনসেপ্ট চালুই হয়নি তখনও।

ভাগ্যিস হয়নি। আমি অত বেশি 'ব্যক্তিগত হাওয়া' সহ্যই করতে পারি না। আমার শুধু পড়াশোনার সময়টা একটু নিরিবিলি দরকার। কিন্তু শৈশব-কৈশোরের ভাড়াবাড়ির দুটো ঘরের একটাতেও তা পাইনি। এখন আর ছেলেবেলার সেই ধৈর্য বা স্ট্যামিনা নেই কিন্তু তাও যখন পড়তে বসি মনে হয় ব্যাপারটার যতটা পারি গভীরে যাই। সেই জায়গা থেকেই লেখা বা খুব জরুরি কিছু পড়ার সময় মোবাইল বন্ধ রাখি অনেক সময়। তার জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিতদের গালাগালি কম খাই না তবু সেসব সহ্য করেও (এবং সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েও) আমি অভ্যাসটা বদলাতে পারি না, আমার মধ্যমেধার কারণেই। কী করব, একবার কনসেনট্রেশন চলে গেলে, তাকে আবার ফিরিয়ে আনা যে কী দুঃসাধ্য কাজ! কথায় বলে, মন না মতিভ্রম। সেই মনকে একটি জায়গায় অনেকক্ষণ আটকে রাখা, আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে, এভারেস্ট জয়ের শামিল।

আমেরিকায় এসব ঝামেলা নেই। উলটে এক নিশ্ছিদ্র নীরবতা গিলে খেতে আসে। যে ভিড়কে বরাবর 'অসুবিধা' মনে করে এসেছি সেই ভিড়ের জন্যই প্রাণ ছটফটাতে

শুরু করল আমার। সাদিক অবশ্য দারুণ খেয়াল রাখছিল আমার। আমার পড়াশোনা চলাকালীন, দু-দুবার কফি বানিয়ে খাওয়াল আমাকে। দু-একটা জায়গায় আমি আটকে গেলে পরে, ল্যাপটপটা হাতে নিয়ে সল্‌ভ করে দিল আমার প্রবলেম। ওর প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে আমি এক-একটা ভাষার হেডিং দিয়ে নীচে সেই ভাষার দিক্‌পাল কবিদের নাম, পরিচিতি, কাব্যগ্রন্থ এবং কয়েক লাইন করে কবিতা আমার ডায়ারিতে তুলে নিতে থাকলাম। এভাবেই গুজরাতের জিভ প্যাটেল থেকে ওড়িশার রমাকান্ত রথ উঠে এলেন আমার খাতার পাতায়, পাঞ্জাবের অমৃতা প্রীতম থেকে কেরালার সচ্চিদানন্দন ঝলমল করতে শুরু করলেন, আপন-আপন বিভায়। বাংলার মণীন্দ্র-শঙ্খ-সুনীল-শক্তি-উৎপল-দেবারতি থেকে ভাস্কর-জয়-সুবোধ-মৃদুল-প্রসূন-জয়দেব-মল্লিকা তো থাকলেনই। খেয়াল রাখতে হচ্ছিল যে আমায় দেওয়া হবে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আর তার মধ্যেই সাম্প্রতিক ভারতীয় কবিতার একটা রূপরেখা আমায় তুলে ধরতে হবে। আর তুলে ধরতে হবে এমন একটা অডিয়েন্সের সামনে যেখানে অন্তত দুজন নোবেলজয়ী তো থাকবেনই। তাঁদের কানের ভেতর দিয়ে যদি মরমে পশে ভারতীয় কবিতা, বিশেষ করে বাংলা কবিতার একটা আদল, যদি একবারের জন্যেও তাদের এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে হয় যে, নোবেল প্রাইজ ব্যাপারটাই, 'অফ দা হোয়াইট, বাই দা হোয়াইট, ফর দা হোয়াইট' হয়ে গেছে, এর একটা পরিবর্তন দরকার, তাহলেই তো কেল্লাফতে।

তার জন্য যত পরিশ্রম হয় আমি করতে রাজি। কিন্তু হাতে সময় খুব কম। তাই সাদিকের বানানো কফি আর সুপারমার্কেট থেকে কিনে আনা আপেল, দই আর মাফিনের ওপর ভর করেই চালিয়ে দিলাম দুটো দিন। নো রান্নাবান্না, নো বাসন-মাজার ঝঞ্ঝাট। শুধু বিস্তৃত একটা মহাসমুদ্রের থেকে ডুবসাঁতার দিয়ে যতগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে আনা যায় আর তার ভেতর থেকে (নির্মলা মিশ্র-র গান যাই বলুক) যত ক-টা সম্ভব মুক্তো বার করে এনে পেশ করা যায়, দুনিয়ার দরবারে।

৩

শুরু করেছিলাম স্বামী বিবেকানন্দ-র শিকাগো বক্তৃতা দিয়ে কারণ ওই বক্তব্যের ছত্রে ছত্রে একটা মহাভারতীয় কবিতা লুকিয়ে আছে বলে আমার মনে হয়। যে-দেশের 'ক্রোশ ক্রোশ মে পানি বদলে, চার-ক্রোশ মে বাণী' তার নানা ভাষা, নানান সংস্কৃতি একটা সুতোয় বেঁধে যে মহামানব প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন আটলান্টিকের এপারে, তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় কবিতার আলোচনাই বা শুরু হবে কী করে? স্বামীজির থেকে চলে গেলাম রবীন্দ্রনাথে, সেখান থেকে কালিদাস হয়ে হিন্দি কবিতায়। নাগার্জুন এবং অজ্ঞেয় হয়ে সাম্প্রতিকে। তারপর 'ভারত এক খোঁজ'। নামদেও ধাসাল থেকে গদর, চন্দ্রকান্ত দেওতালে থেকে নবকান্ত বড়ুয়া সবাইকে ছুঁয়ে গেলাম যতটা পারলাম। রতন

থিয়াম থেকে বিজয় তেন্ডুলকর কিংবা রাসকিন বন্ড এবং মনোজ দাশকেও বাদ দেওয়া গেল না কারণ কবিতা তো শুধু কবিতাতেই নেই। হাতের ঘড়িটা সামনে খুলে রেখেছিলাম কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় যখন ঢুকেছি তখন দেখলাম, হিসেব মতো কুড়ি মিনিট আমার হাতে নেই, আছে মাত্রই এগারো মিনিট মতো।

সে-হিসেব অবশ্য শেষ অবধি মানতে হয়নি আমার। আইওয়া লেখক শিবিরের ডিরেক্টর ক্রিস মেলির-এর সস্নেহ অনুমোদনে আমি আমার সময় ছাপিয়ে আরও প্রায় পনেরো মিনিট মতো বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই ভারতীয় উপমহাদেশও চলে এসেছিল বৃত্তের মধ্যে। আর সারা সগুফতার মতো পাকিস্তানি কবিই যখন এলেন তখন আমারই বাংলা ভাষার শামসুর রহমান, সৈয়দ সামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ বা রফিক আজাদদের বাদ দেব কোন নিবুর্দ্ধিতায়? বাদ দিইনি। যতটা পেরেছি, বাংলা কবিতার এক সামগ্রিক চিত্র রেখে এসেছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিতাপ্রেমীদের সামনে। ইংরেজিতে বাংলা কবিতা নিয়ে বলতে বলতে আবিষ্কার করেছি, কবিতার একটা আন্তর্জাতিক ভাষা আছে। দেবারতি মিত্র-র কবিতার বাঙালি অনুষঙ্গ যে ধরতে পারছে না সেই মল্লিকা সেনগুপ্ত-র 'আপনি বলুন মার্ক্স, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে' শুনে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠছে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তর কোলকাতার কবিতা' আমার প্রিয়তম কয়েকটি কবিতার বইয়ের একটি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম তার কিছুটা আমেজ, কয়েক টুকরো বেদনা যদি আইওয়ার ক্লাসরুমে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিরিয়ানি খাওয়াতে চাওয়া ভক্তের আকুতি কিংবা বন্যার মধ্যেও 'মায়ের' চোখ আঁকা জীবন পালের শিল্প হয়তো বা অনুবাদের লাঞ্ছনা পেরিয়ে ভিন-ভাষার মানুষের কাছে তত পরিস্ফুট হয় না। উলটোদিকে 'কার দিকে তুমি গুলি ছুঁড়ছ হে / এখানে সবাই মানুষ' কিংবা 'বাবুদের লজ্জা হল / আমি যে কুড়িয়ে খাব'র আবেদন কী সর্বজনীন। সুবোধ সরকারের কবিতায় 'পৃথিবীর সর্বত্র ছেলের জন্য ভাত বেড়ে বসে আছে মা' লাইনটা বলেই যেমন একটা ফোঁপানো কান্নার শব্দ শুনে চুপ করে যাই আমি। ক্যামিলা ম্যাকফারসন নামের একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় অনুরোধ করে কবিতাটা আবার পড়ার জন্য। কিছুটা অবাক আমি তাকিয়ে আছি তখন, ক্রিস মেরিল মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন, কেন সে আবার শুনতে চাইছে কবিতাটা। কান্নাভেজা গলায় মেয়েটা উত্তর দেয় যে ওর মা-ও রোজ ওর দাদার জন্য খাবার বেড়ে অপেক্ষা করেন। ওর দাদা রবার্ট ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের এক সৈনিক ছিল কিন্তু বাড়িতে তো সে একটা ছেলেই ছিল, শুধু। আর ফিরে না আসা দাদার কথা ওকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলেই ও আবার শুনতে চায় কবিতাটা।

ক্যামিলার অনুরোধ রক্ষা করে, আবারও সুবোধদার কবিতাটা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম যে আমার ব্যক্তিগত পছন্দের ভোট অবশ্যই থাকবে প্রসূনদার, ভালো করে খেতে-না-পাওয়া 'ঠাকুর' কিংবা মণীন্দ্রবাবুর একটু হেলে থাকা 'শিব'-এর দিকে কিন্তু

একইসঙ্গে এ কথা স্বীকার করতেও আমি বাধ্য যে ঠাকুরকে দেওয়া মানুষের ভোগ যতখানি পৌঁছোয়, মানুষের জন্য বেড়ে রাখা খাবার তার চেয়ে বেশি। প্রথমটার 'রেঞ্জ' বেশি কিন্তু দ্বিতীয়টার 'রিচ'।

কবিতার ক্লাস থেকে এ একেবারে আমার হাতে-গরম অভিজ্ঞতা।

ওই কবিতা দিয়েই শেষ করেছিলাম কিন্তু ক্রিস মেরিল আমার উপস্থাপনার শেষে আমায় অনুরোধ করলেন, এমন একটা সেতুর কথা যা ধরে কবিতার স্বপ্নে জেগে থাকা সব মানুষ চলাচল করতে পারে। তৈরি ছিলাম না, তবু ও রকম জায়গায় অত মানুষের সমানে ক্রিসের কথা ফেরাতে পারলাম না বলে, মনের ভেতরে হাতড়াতে শুরু করলাম। কতটা আকর আর কতটুকু গুল্ম উঠে এল জানি না, তবু যা পেয়েছিলাম আর ভাগ করে নিয়েছিলাম সবার সঙ্গে, তারই একটা অংশ দিয়ে এই লেখা শেষ করি... 'We are all, at different times in our lives, made aware that we are simply not at home, that we have become simply, 'other' in our circumstances, whether we've crossed the borders of other countries or perhaps just the borders of the heart. Those profound feelings of alienation, loneliness, exclusion and judgement can occur throughout the world and even in our own 'homes', those very place we have built and created to counter that solitude we so often experience in the world, that larger world which unfolds so constantly and complexly around us. More and more these days, it seems to me that the job of every one of us, whatever our occupations or professions, is to try and make this world a slightly less lonely place, to help me make out of those clusters of individual 'homes' scattered across the planet some more elaborate and connected conversation of hope, by which I mean a joining of voices, some alignment of possibilities, and the claiming, person by person, nation by nation, of our fragile, worldly home.'